পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যে নারী আন্দোলনের ধারা ও গতি-প্রকৃতি: একটি বিশ্লেষণ

জান্নাতুল ফেরদৌস*

সারসংক্ষেপ

প্রাচীন কাল হতে নারীরা পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের কাছ থেকে নিগৃহীত হয়ে আসছে। অত্যাচার ও অবমাননার কারণে নারী সমাজের মনে ক্ষোভ পুঞ্জিভূত হচ্ছিল। ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে নারী আন্দোলনের সূচনা হয়। বিভিন্ন রাষ্ট্রে নারীরা সংগঠিত হয়ে স্বাধীনতা, অধিকার ও সমতার দাবীতে বিভিন্ন সময়ে আন্দোলনের ডাক দেয় এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের কাছ থেকে তাঁদের প্রাপ্য দাবী আদায়ে তৎপর হয়। পাশ্চাত্যেই প্রথম নারী আন্দোলনের সূচনা হয়। পরবর্তীতে প্রাচ্যের নারীসমাজও নিজেদের অধিকার বাস্তবায়নের দাবীতে আন্দোলন করে। নিজেদের সংগঠিত করার লক্ষ্যে নারী সমাজ বিভিন্ন সংগঠন গড়ে তোলে। এ প্রবন্ধে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যে নারী আন্দোলনের প্রেক্ষাপট ও ধারাবাহিকতা তুলে ধরে উভয় ক্ষেত্রে নারী আন্দোলনের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে এর মূল্যায়ন করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

ভূমিকা

পৃথিবীর বিভিন্ন আন্দোলনের মতো নারী আন্দোলনের ইতিহাসও বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। মূলত নারী আন্দোলন হলো সমাজ বিবর্তনের ইতিহাসের সাথে শোষিত ও বঞ্চিত নারীর জীবন-মান পরিবর্তনের ইতিহাস। নারী আন্দোলনের মাধ্যমে নারীর প্রাপ্য অধিকার ভোগ সহজতর হয়েছে। লক্ষ করলে দেখা যায়, বিভিন্ন ত্যাগ ও সংগ্রামের মাধ্যমে পুরুষ ও সমাজের শাসন উপেক্ষা করে নারী আন্দোলন এগিয়ে গেছে। বলাবাহুল্য, নারী আন্দোলনের এ পথ সহজ সাধ্য ছিল না। সমাজের সকল স্তরের নারীকে সংগঠিত করতে নারী আন্দোলনকারীদের অনেক দুঃখ-কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার

* প্রভাষক, দর্শন বিভাগ, ঈশ্বরগঞ্জ সরকারি কলেজ, ময়মনসিংহ

করতে হয়েছে। প্রথম দিকে নারী আন্দোলনকারীদের সাথে সমাজের উচ্চবিত্ত নারীরা একাত্মতা ঘোষণা করলেও সমাজের নিম্নস্তরের সাধারণ নারীরা একমত হতে পারেনি। কারণ পূর্বের সমাজ ব্যবস্থায় নারীসমাজ পুরুষের অধীনে থেকে শোষণ ও বঞ্চনা অবস্থাকেই স্বাভাবিক মনে করতো। ব্যক্তি হিসেবে পুরুষ পরিবারের অভিভাবক সুতরাং পুরুষ সব সুবিধা ভোগ করবে-এ ধারণায় নারী সমাজ অভ্যস্থ হয়ে পড়েছিল এবং সেভাবেই নারী নিজেকে পরিবারে মানিয়ে নেয়ার চেষ্টা করেছে। কিন্তু নারীর অধঃস্তন হওয়ার বিষয়টি যে স্বতঃসিদ্ধ কোন নিয়ম নয় তা সাধারণ নারী সমাজকে বুঝতে বিস্তর সময় অতিবাহিত করতে হয়েছে। বিভিন্ন অত্যাচার, বঞ্চনা ও অধিকারহীনতার ফলে নারী সমাজের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। ফলশ্রুতিতে সূচিত হয় আন্দোলনের প্রেক্ষাপট। নারী আন্দোলনের অব্যাহত গতিধারায় নারী সমাজ তাদের অধিকার সমন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে এবং আরো সংগঠিতভাবে আন্দোলনের গতি ত্বরান্বিত করে। এ প্রসঙ্গে মালেকা বেগম বলেন যে "নারীর স্বার্থে সামাজিক, পারিবারিক, আইনগত সংস্কার ও রাজনৈতিক অধিকারের সন্ধানেই সূচিত হয়েছিল নারী আন্দোলনের প্রেক্ষাপট।"[১]

১.১ পাশ্চাত্যের নারী আন্দোলন

বিশ্ব জুড়ে চলছে নারীর বঞ্চনা, শোষণ ও মর্যাদাহানী। আদিম সমাজে নারীর কর্তৃত্ব বজায় থাকলেও পরবর্তীতে যখন সমাজে সামন্তপ্রথা চলে আসে তখন পরিবারের কর্তৃত্ব পুরুষের হাতে চলে যায় এবং নারী অধঃস্তন হয়ে জীবন কাটাতে থাকে। নিজেদের অস্তিত্ব আর সম্মান অর্জনের জন্য বিভিন্ন দাবী নিয়ে নারী সমাজ সংগঠিত হয় এবং আন্দোলনের পথ বেছে নেয়। পাশ্চাত্যে প্রথম নারী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়, বিশেষ করে ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লবের পর যখন নারীসমাজ বেকার হয়ে পড়ে। এ সময় বিভিন্ন অধিকার আদায়ের দাবীতে নারী সমাজ সোচ্চার হয়ে ওঠে। পাশ্চাত্যের অর্থনৈতিক সংকটের সময়ে বিভিন্ন শোষণ হতে মুক্তি ও অধিকার আদায়ের উদ্দেশ্যে নারী আন্দোলনের সূচনা হয়।

নারী আন্দোলনকারীরা নারীর প্রতি বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মে নিযুক্ত হয়েছেন। ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহে নারীর ভূমিকা প্রশংসাযোগ্য হলেও এসব রাষ্ট্রের নারীরা বৈষম্যের শিকার ছিল। পাশ্চাত্য সমাজে বিশ শতকেও নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলেছে। বিশ শতকে নারী আন্দোলনকারীরা এ মত প্রকাশ করেন যে, জ্ঞান চর্চা হবে নারীর দৃষ্টিভঙ্গিতে, কারণ পুরুষ যে দৃষ্টিভঙ্গিতে নারীর জ্ঞান চর্চার কথা বলেন তা নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক। বিশ শতকে পাশ্চাত্যের অনেক চিন্তাবিদ নারীর প্রতি বৈষম্যের জন্য পুরুষ প্রধান সমাজকে দায়ী করেছেন। নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা, নারীর

পরনির্ভরশীলতা দূর করা, সব বৈষম্য ও শোষণ থেকে নারী সমাজকে মুক্তি দেয়ার লক্ষ্যে নারী ও পুরুষ নির্বিশেষে প্রগতিশীল চিন্তাবিদগণ সমাজে আন্দোলন করেছিল। অবস্থার পরিবর্তনের জন্য নারীসমাজ আইনগত অধিকার আদায়ের প্রয়াস চালায়। প্রথাগত ও ঐতিহ্যগতভাবেই নারীর প্রতি পাশ্চাত্য সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল নেতিবাচক এবং মর্যাদাহানীকর। কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া সমাজের সব স্তরের পুরুষই নারীর প্রতি অশোভন ও অন্যায় মনোভাব পোষণ করেছে। পুরুষের অশোভন ও অন্যায় আচরণের মধ্য দিয়ে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির নেতিবাচক প্রতিফলন যেমন : যৌতুক প্রথা, এসিড নিক্ষেপ, ধর্ষণ, পর্নোগ্রাফি ইত্যাদি ঘটছে নারীর প্রতি। নারীর প্রতি উদাসীন ও হীনমন্য দৃষ্টিভঙ্গির কারণে হ্যারিয়েট মার্টিনিয়্যু ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, বিগত পঞ্চাশ বছরে সমাজ পরিবর্তিত হয়েছে যথেষ্ট কিন্তু নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি বদলালো না। সে সময়ে এ মতবাদই প্রচারিত হতো যে, বাবা, ভাই, স্বামী ও ছেলের ওপর নারী নির্ভরশীল থাকলে তা সমাজের জন্য মঙ্গলকর হবে। হ্যারিয়েট মার্টিনিয়্যু সমাজে প্রচলিত এ মতবাদ ও এ জাতীয় আইনের বিরুদ্ধে এবং নারীদের শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। সে সময় ইংল্যান্ডের জন স্টুয়ার্ট মিল (১৮০৬-১৮৭৩) তাঁর *The Subjection of Women (1869)* গ্রন্থে নারীর শোচনীয় অবস্থার কথা তুলে ধরে বলেন, "আজকের দিনে বিয়েই হল একমাত্র ক্ষেত্র যেখানে আইনত দাস প্রথা বজায় আছে।"[২] নারীর প্রতি চলমান এ দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের জন্য আন্দোলন করা হয়।

সাম্য ও স্বাধীনতা অর্জনের জন্য নারীদের আন্দোলন করতে হয়েছে। সতের শতকে যখন ইংল্যান্ডে দাস ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন হয় তখন পারিবারিক, সামাজিক ও ধর্মীয় অনুশাসনে বৈষম্য থাকায় নারী সমাজের মধ্যে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে ওঠে। নারী জাগরণের সূচনালগ্নেও নারীসমাজ পুরুষের সমান ক্ষমতা অর্জনের প্রয়াস চালায়। সেজন্য পুরনো মূল্যবোধের বিরুদ্ধে নারী সমাজ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়।[৩]

সতের শতকের নারী জাগরণ আঠার শতকে পুরো ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। পাশ্চাত্যের নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নারী আন্দোলনে এ পর্যায়ে মধ্যবিত্ত সমাজ অংশ নেয় এবং নারীর স্বার্থে নিম্নোক্ত দাবী সমূহ পেশ করে :

ক) পরিবারে নারীর মর্যাদা ও ভূমিকা নির্দেশিত হতে হবে;

খ) সম্পত্তিতে নারীর অধিকার দিতে হবে;

গ) নারীর নিজস্ব আয়ের ওপর তার অধিকার আইনগতভাবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

নারীবাদের প্রবর্তক মেরি ওলস্টোনক্র্যাফ্ট নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার যৌক্তিকতা তুলে ধরে তাঁর মত প্রতিষ্ঠা করেন। পাশ্চাত্যের নারী আন্দোলনের বিভিন্ন দাবীর প্রসঙ্গে আসে নারী শিক্ষার কথা। শিক্ষা ছাড়া নারী উন্নয়ন সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে নারীবাদী চিন্তাবিদ মেরি ওলস্টোনক্র্যাফ্ট (১৭৫৯-১৭৯৭) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। নারীর শিক্ষার প্রতি তিনি বিশেষ জোর দিয়ে বলেছেন যে, শিক্ষাসহ সবক্ষেত্রে পুরুষের পাশাপাশি নারীকে সমমর্যাদা দিতে না পারলে কোন উন্নতিই হবে না বরং উন্নতি ব্যাহত হবে। হ্যারিয়েট মার্টিনিয়্যু (১৮০২-১৮৭৬) তাঁর রচনার মাধ্যমে মেরি ওলস্টোনক্র্যাফ্টের পরবর্তী ইংল্যান্ডের নারীসমাজকে সংগ্রামে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। ভিক্টোরিয়া যুগে যখন নারীবাদী আন্দোলন তীব্র হয় সে সময় এ হ্যারিয়েট ১৮২১ সালে নারী শিক্ষা বিষয়ে লিখেছেন। তিনি নারীর শোচনীয় অবস্থার বর্ণনা করে বলেন, "শিক্ষা ছাড়া নারীর পরনির্ভরশীলতা ও নির্যাতন বন্ধ করা যাবে না।"[৪] পাশ্চাত্যের নারী আন্দোলন কর্মসূচির উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল নারী শিক্ষার প্রসার ঘটানো এবং উচ্চতর শিক্ষায় নারীর সুযোগ বৃদ্ধি করা।

পাশ্চাত্যে যখন নারী আন্দোলনের উদ্ভব হয় তখন নারীর নিজস্ব কোন মর্যাদা ছিল না। সেজন্য নারী আন্দোলনকারীরা নারীর মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করেছেন। নারীর অমর্যাদা লক্ষ করে অনেক চিন্তাবিদ প্রতিবাদ করেছেন। তাঁদের মধ্যে ফরাসী ইউরোপীয় সমাজতন্ত্রী শার্ল ফুরিয়ে (১৭৭২-১৮৩৭) অন্যতম। তিনি নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করেছেন। ফরাসী বিপ্লব (১৭৮৯) দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে জ্যাঁ জ্যাক রুশোও সামাজিক অন্যায় সম্পর্কে মেরি ওলস্টোন ক্র্যাফট্‌কে সাহায্য করেন। তৎকালীন সময়ে পাশ্চাত্যের সমাজে দাস প্রথা প্রচলিত ছিল। নারীদের পণ্যের মতো ক্রয়-বিক্রয় করা হতো। বিশেষ করে কৃষ্ণ সমাজে নারীসমাজ দাসী হিসেবে বিক্রি হয়ে অত্যন্ত অবমাননাকর জীবনযাপন করত। দাস ব্যবসা দূরীকরণের আন্দোলনে ১৮৩২ সালে আমেরিকার নারীসমাজ অংশ গ্রহণ করে। নারীর চারিত্রিক কমনীয়তা ও নারীত্বের ব্যাখ্যার মাধ্যমে নারীকে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখার প্রয়াসকারীদের বিরুদ্ধে মেরি ওলস্টোনক্র্যাফ্ট এবং তাঁর পরবর্তী নারী নেত্রীগণ আন্দোলন করেছেন। কারণ ন্যায়ের দৃষ্টিতে প্রতিটি মানুষই সমান। লরেঞ্জ ডনস্টোন তাঁর *Women from Standpoint of Political Economy* গ্রন্থে বলেন, "পুরুষ চায় এমন নারী যে শুধু তাকেই ভালোবাসবে। কেবল তাই নয়, যার স্পর্শ তাঁর ললাট স্নিগ্ধ করবে, সংসারে সুখ-শান্তি আনবে। হাজার রকম খুঁটিনাটি সমস্যার সমাধান করে সংসারকে সুন্দর করবে, সর্বোপরি নারীর অপরূপ মহিমা তাঁর পারিবারিক জীবনকে মধুর উত্তাপে ভরে রাখবে।"[৫] এমন লেখকবৃন্দ নারীকে স্তুতির মাধ্যমে গৃহবন্দি রাখার চেষ্টা করেছেন। মেরি ওলস্টোনক্র্যাফ্ট নারী সমাজকে এ ধরনের অপচেষ্টার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে আহবান জানান। মেরি ওলস্টোনক্র্যাফ্ট তাঁর *The Vindication of*

the Rights of Women (1792) এবং *The Wrongs of Women* গ্রন্থ দ্বয়ে নারীর অধিকার বিষয়ে জোরালো বক্তব্য তুলে ধরেন। তার সময়ে আইনত নারীর অধিকার স্বীকৃতি পেলেও তা বাস্তবায়ন করা ছিল কষ্টকর বিষয়। তথাপি তিনিই প্রথম নারী সমাজকে ভোটাধিকারের জন্য সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেন ও নারী সমাজের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনাবোধ জাগ্রত করেন।

পাশ্চাত্য নারী আন্দোলনকারীদের কর্মসূচির মধ্যে সমাজ সংস্কার ছিল অন্যতম। সমাজ এবং রাষ্ট্রে নারীর বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে স্বামী পরিত্যক্ত হওয়া ও শ্রমের ন্যায্য মজুরী হতে বঞ্চিত হওয়া, পতিতা জীবনযাপন করতে বাধ্য হওয়া, বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকারহীন অবস্থা মেনে নিতে বাধ্য হওয়া ইত্যাদি ছিল অন্যতম। আমেরিকা, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, হল্যান্ড, জার্মানী সর্বত্র অভাবের তাড়নায়, জীবিকার সংস্থান করতে না পারায়, স্বামী পরিত্যক্ত হওয়ার কারণে নারীদের পতিতাবৃত্তিও বেছে নিতে হতো। এ আন্দোলনের ফলে ১৭৯৩ সালের জুন মাসে ফ্রান্সে বিশেষ আইন পাস হয় তাতে অনাথ শিশুদের শারীরিক ও নৈতিক শিক্ষার ভার রাষ্ট্রকে গ্রহণ করার দাবী উত্থাপন করা হয়। শিশুর দায়িত্ব রাষ্ট্র নিলেও যত্নের অভাবে শিশু মৃত্যু ঘটে। ১৮০৩ সালে গর্ভপাত আইন নিষিদ্ধ হয় এবং গর্ভপাতের জন্য নারীর মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা দেয়া হয়।[৬] এর ফলশ্রুতিতে গর্ভপাত বিরোধী আইনের বিরুদ্ধে নারীরা আন্দোলন করে।

ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গেল (১৮২০-১৯১০) সমাজে নারীর দুরবস্থা অপসারণ করার জন্য সোচ্চার হন। নার্সিং বৃত্তির প্রবর্তনের জন্য তাকে অনেক সংগ্রাম করতে হয়েছিল। তাঁর সময়ে নারীদের সাধারণ শিক্ষার বাধা দূর হলেও ডাক্তারী ও নার্সিং বিষয়ে নারীদের শিক্ষার বাধা রয়ে যায়। ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গেলের প্রতিবাদ জানানোর ফলে এসব বাধা ক্রমান্বয়ে অপসারিত হয়।

পাশ্চাত্যের নারী আন্দোলনের নেত্রীরা ভোটাধিকারের দাবী করেন। নারীর ভোটাধিকারের আন্দোলনকে সংকীর্ণ নারীসুলভ দৃষ্টিভঙ্গির সৃষ্টি বলে নারীর ভোটাধিকার বিরোধীরা এমন অভিমত পোষণ করেন যে, "পুরুষের অধিকার মিলিত বাস্তবায়ন হলেই নারীর অধিকার রক্ষা করা সম্ভব।"[৭]

আঠার শতকের শেষে মধ্যবিত্ত সমাজের নারী আন্দোলনের রাজনৈতিক দাবী হিসেবে 'ভোটাধিকার' কর্মসূচি যুক্ত হয়। বিবাহিত, অবিবাহিত, সম্পত্তিবান সকল নারীই সে সময় সামাজিক, আইনগত ও রাজনৈতিক ভোটাধিকারের দাবীতে আন্দোলনে আগ্রহী হয়ে ওঠে। এ আন্দোলনের পথ খুব সহজসাধ্য ছিল না। সম্পত্তিবান নারীরা ভোটাধিকার ও সম-অধিকারের পক্ষে ছিল। ১৮৬৭ সালের পূর্ব পর্যন্ত শুধু বিত্তবান শিক্ষিত পুরুষেরা ভোট দিত। পরে অবশ্য ত্রিশ বছর ও তার চেয়ে বেশি বয়সের বিবাহিত নারীদের

ভোটাধিকার বিবেচনা করা হয়। ১৮৬৭ সালে ইউরোপ ও আমেরিকায় সর্বজনীন ভোটাধিকার প্রবর্তন করতে গিয়ে নারীর ভোটাধিকারের দাবী বাতিল হয়ে যায়। ভোটাধিকার আন্দোলনে নেতৃত্ব দানকারী সংগঠন ও ব্যক্তিদের মধ্যে আগে থেকেই এরকম ভাবনা ছিল যে, সীমিতভাবে যদি নারীর ভোটের অধিকার পাওয়া যায় তবুও বাধা থেকে যাবে। পাশ্চাত্য নারীর ভোটাধিকারের বিষয়টি সম্পর্কে রিটা মে কেলী ও মেরি বুটিলিয়ার তাঁদের *রাজনৈতিক নারীর অভ্যুদয় (১৯৯১)* গ্রন্থে মত প্রকাশ করে বলেন যে, "সাম্প্রতিকালের অর্থ্যাৎ বিংশ শতাব্দীর শেষ দুই শতকে সমীক্ষাগুলির ফলাফলে দেখা গেছে যে, নারীদের ভোট প্রদানের প্রবণতা যুক্তরাষ্ট্রে লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। নারীদের পরিবর্তনশীল ভূমিকা ও সমাজের ওপর নারী আন্দোলনের প্রভাবের সত্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য নারী আন্দোলনের প্রবক্তাগণ নারী ও পুরুষের ভোট প্রদানের হারের ব্যবধানের সঙ্কোচনকে রাজনৈতিক আগ্রহের প্রমাণের সহজ পরিমাপ হিসাবে ব্যবহার করে থাকেন।"[৮] ব্রিটেনের উপনিবেশবাদী রাষ্ট্রসমূহে বিভিন্ন আন্দোলনের মধ্য দিয়ে নিউজিল্যান্ডে ১৯২৮ সালে সর্বপ্রথম নারী ভোটাধিকার, ১৯২৮ সালে ইংল্যান্ডে একুশ বছরের নারী ভোটাধিকার ও ব্রিটিশ কলোনিগুলোতেও নারীরা ভোটাধিকার লাভ করে। এখানে লক্ষণীয় যে, নারী ভোটাধিকারের জন্য পাশ্চাত্যেও নারী সমাজকে দীর্ঘ সংগ্রাম করতে হয়েছে।

আঠার শতকে পাশ্চাত্যে নারীর অধিকার, সাম্য ও সমতার জন্য আন্দোলনের সময়ে শ্রমজীবী নারীদের মজুরীর সমতার জন্য আন্দোলন শুরু হয়। কারণ সে সময়ে বিশেষত শিল্প বিপ্লবের পর নারী ও পুরুষের শ্রমের মজুরীর বৈষম্য অধিক মাত্রায় বেড়ে গিয়েছিল। ১৮১৯ সালে ম্যানচেষ্টারে শ্রমজীবী মানুষের যে মিছিল হয় তাতে নারীসমাজ যোগ দেয়। নারী শ্রমিকেরা স্বীয় কর্মস্থলে মজুরী বৈষম্য দূর করার জন্য সংগ্রাম করতে থাকেন। জার্মান অর্থনীতিবিদ ও সমাজতন্ত্রের জনক কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩) ও ফ্রেডরিক এঙ্গেলস্ (১৮২০-১৮৯৫) তাঁদের *কমিউনিষ্ট মেনিফেস্টো (১৮৪৮)* গ্রন্থে এ তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেন যে, শ্রমজীবী মানুষের মুক্তির সঙ্গে নারীর মুক্তি জড়িত।[৯]

পাশ্চাত্যের নারী আন্দোলনের সময় নারী সমাজ বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছিল। ব্রিটেন ও আমেরিকার নারী আন্দোলনের প্রভাবে প্রখ্যাত সাহিত্যিক ভার্জিনিয়া উল্ফ (১৮৩২-১৯৪১) *A Room of One's Own* গ্রন্থটিতে লিখেন যে, "নারী জাগরণের কাহিনী অপেক্ষা বেশি কৌতূহলকর হচ্ছে নারী জাগরণের পুরুষ কর্তৃক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির ইতিহাস।"[১০] সামাজিক প্রতিবন্ধকতার কারণে নারীসমাজ শিক্ষার অধিকার ও সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। সে জন্য উনিশ শতকের পর থেকে

নারী আন্দোলনের কর্মসূচিতে শিক্ষা, ভোটাধিকার ও সম্পত্তির অধিকারের দাবী অন্তর্ভুক্ত হয়। এ আন্দোলনের নেতৃত্ব দানকারীরা নারীর বিভিন্ন কর্ম, বিবাহ, সন্তানের অভিভাবকত্ব, সম্পত্তির অধিকার ইত্যাদির আইনগত সংস্কারের বিষয়ে আন্দোলন করেছেন। নারীর আইনগত অধিকার বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন সংগঠন নারী-পুরুষ আইনের বৈষম্যের বিরুদ্ধাচার করে। বিদ্যমান আইনও নারীর উন্নয়নের পথে বাধা ছিল, তাই সমতার নীতির ভিত্তিতে নারীর জন্য আইনের সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সে লক্ষ্যে নারীবাদীরা আন্দোলন চালিয়ে যায়। বিবাহ সংক্রান্ত বিষয়েও সংস্কার সাধনের জন্য নারীরা আন্দোলনে লিপ্ত হয়। আন্দোলনকারীদের মধ্যে বেসি রেনন পারকেস (Bessie Raynon Parkes) মেরি হাউইট (Mary Howitt) ও এ্যান জেমিসন'র (Ann Jameson) নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁরা বিবাহ বিষয় নিয়ে প্রথম নারীর অধিকার আদায়ে ব্রতী হন। এ বিষয়ে তাঁরা বৃটিশ পার্লামেন্টে আবেদন করেন কিন্তু সফল হননি। ১৮৫৭ সালে স্ত্রী'র প্রতি নিষ্ঠুরতা ও ব্যাভিচারের কারণে স্বামীকে আইনগতভাবে বিচ্ছেদ ও তালাক প্রদানের অধিকার দেয়া হয়। যদিও স্বামীর সম্পত্তি ও অর্থের ওপর স্ত্রী'র কর্তৃত্বের দিকটা নিয়ে কোন মীমাংসা তখন হয়নি। ১৮৭৮ সালে বৃটিশ নারী নিজ উপার্জনের ওপর কিছুটা কর্তৃত্ব লাভ করে এবং ১৮৮২ সালে স্ত্রীকে স্বাধীনভাবে সম্পত্তির মালিক হওয়ার অধিকার প্রদান করা হয়।[১১]

আঠার শতকে নারী আন্দোলনের নেত্রীগণ শিশু ও মায়েদের অধিকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করেছেন। ১৮৭৮ সালে সুইজারল্যান্ড প্রথম দেশ হিসেবে শ্রমজীবী মায়েদের জন্য আট মাসের প্রসূতিকালীন ছুটির আইন ঘোষণা করে। পরবর্তীতে মা ও শিশুর কল্যাণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশে নারী আন্দোলন ঘটে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, নারী আন্দোলনের ফলে মা ও শিশুর স্বার্থে ইটালীতে ১৯০৫ সালে, জার্মানীতে ১৯১০ সালে, ফ্রান্সে ১৯০৮-১৩ সালে ও ব্রিটেনে ১৯০৯-১৩ সালে প্রসূতি মাতার অধিকার বিল নিয়ে আন্দোলন হয় এবং ইউরোপের আটটি রাষ্ট্রে যথা– ইটালী, ফ্রান্স, নরওয়ে, সুইজারল্যান্ড, রাশিয়া, রুমানিয়া, ইংল্যান্ড ও অষ্ট্রেলিয়ায় প্রসূতিদের সাহায্য ভাতা দেয়া হয়।[১২]

ঐতিহাসিক ফরাসী বিপ্লবে (১৭৮৯) অনেক নারী ও শিশু অংশগ্রহণ করে। ফ্রান্সের জাতীয় পরিষদে ১৭৮৯ সালে নারী সমাজ এক স্মারকলিপিতে জানায় যে, নারী ও পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য, নারীর শ্রমের ও কাজের অধিকারের জন্য এবং তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী কর্মে নিয়োগের জন্য সরকারকে সচেষ্ট হতে হবে। ১৯৭৩ সালের আন্তর্জাতিক কনভেনশনে 'মানুষের অধিকার' ঘোষিত হলেও নারীর অধিকার বিষয়ে কোন বক্তব্য না থাকায় ফরাসী নারী সমাজ এ বিষয়ে প্রতিবাদ ও

আলোচনা শুরু করে এবং ফলশ্রুতিতে কনভেনশনের ১৭ নম্বর ধারায় 'নারীর অধিকার' সংযোজিত হয়। ফরাসী বিপ্লবে নারীসমাজ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিল এবং প্রতিক্রিয়াশীল ইউরোপীয় আক্রমণের সময় রাষ্ট্র রক্ষার জন্য ফরাসী নারীরা অস্ত্র হাতে সংগ্রাম করেছিল। উল্লেখ্য যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত মুসলিম প্রজাতন্ত্রের নারীসমাজ সমগ্র মুসলিম বিশ্বের মধ্যে বৈষয়িক ও মানসিক উভয় দিক থেকে সবচেয়ে স্বচ্ছল ও অগ্রসর নারী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

শ্রমের অধিকার বাস্তবায়নের জন্য ১৮৫৭ সালের ৮ মার্চ যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে একটি সুচ কারখানার নারী শ্রমিকেরা দৈনিক ১২ ঘণ্টার পরিবর্তে ৮ ঘণ্টা কাজের দাবীতে ও ন্যায্য মজুরী এবং কর্মক্ষেত্রে সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করার দাবীতে সোচ্চার হয়েছিল। এ কারণে গ্রেফতার হন অনেক নারী। ১৯০৮ সালে ৮ মার্চ আমেরিকার শিকাগো শহরে পোশাক শিল্পে দেড় হাজার শ্রমিক আন্দোলন করেন ৮ ঘণ্টা কাজের দাবীতে আন্দোলন করে কয়েকজন নারী নিহত হয়। ১৯১০ সালে ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনে ৮ মার্চকে ক্লারা জেটকিন আন্তর্জাতিক নারী দিবস ঘোষণা করেন। ১৯৭৫ সালে জাতিসংঘ ৮ মার্চকে নারী দিবস পালন করা শুরু করে । ১৯৭৭ সালে জাতিসংঘ আনুষ্ঠানিকভাবে আন্তর্জাতিক নারী দিবসের স্বীকৃতি দেয়।

আমেরিকার বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনের রূপকার রোজা লুইস ম্যাককুলি সংক্ষেপে রোজাপার্ক কারাবরণ করেছিলেন কৃষ্ণাঙ্গদের অধিকার আদায়ের জন্য। শ্বেতাঙ্গদের অধিকার ছিল সংরক্ষিত। ১৯৫৫ সালের ১ ডিসেম্বর এক তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনের সূচনা হয়। রোজাপার্ক কৃষ্ণাঙ্গদের বিশেষ করে কৃষ্ণাঙ্গ নারীদের নাগরিক অধিকার আদায়ের সংগ্রাম করেন। পরবর্তীতে মার্টিন লুথার কিং'র নেতৃত্বে ১৯৬৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রে কৃষ্ণাঙ্গদের নাগরিক অধিকার আইন পাশ হয়। ফলে তিনি আমেরিকার ইতিহাসে 'মাদার অফ দ্য সিভিল রাইটস মুভমেন্ট' খেতাবে ভূষিত হন। কৃষ্ণাঙ্গদের অধিকার চর্চার জন্য তিনি কাজ করেন। এর ফল হিসেবে প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে কলিন পাওয়েল ও কন্ডোলিৎসা রাইসের মত প্রভাবশালীদের দেখতে পাওয়া যায়।[১৩]

নারী জাগরণের যুগে ইংল্যান্ডে, জার্মানি, আমেরিকা ও ইউরোপের নারী সমাজ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের গুরুত্ব উপলব্ধি করে বিভিন্ন সংগঠন গড়ে তোলেন। এগুলো হল: ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল অব উইমেন (১৮৮৮), ওয়ার্ল্ড ইউনিয়ন অব ক্যাথলিক উইমেন (১৯০১), ইন্টারন্যাশনাল এ্যালায়ান্স অব উইমেন (১৯০৪), ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব ইউনিভার্সিটি উইমেন (১৯১৯), ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব বিজনেস এন্ড প্রফেশনাল উইমেন (১৯৩০) এবং

আন্তর্জাতিক গণতান্ত্রিক নারী ফেডারেশন (১৯৪৫) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[১৪] এ সংগঠনগুলো গড়ে উঠেছিল নারীদের নানাবিধ সমস্যার প্রেক্ষিতে।

সুতরাং, পাশ্চাত্যের নারী আন্দোলন সম্পর্কে বলা যায়, পাশ্চাত্যের নারীর স্বাধীনতা, অধিকার ও সমতা বাস্তবায়নের জন্য এবং সমাজের বিভিন্ন বৈষম্য থেকে নারীকে রক্ষার জন্য যে নারী আন্দোলনের উদ্ভব ও বিকাশ হয়েছিল তা বর্তমানেও অব্যাহত আছে। এটা স্বীকার্য নারী সমাজের উন্নয়নে এ আন্দোলনের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম।

১.২ প্রাচ্যের নারী আন্দোলন

ইউরোপে যে সময়ে নারী জাগরণের সূচনা হয় সে সময়ে প্রাচ্যে নারী জাগরণমূলক কার্যকলাপ তেমন শুরু হয়নি। প্রাচ্যের ভারতবর্ষের নারী সমাজ পরাধীন, শৃঙ্খলিত ও বৈষম্য পীড়িত থাকার ফলে নারী অধঃস্তন জীবনকেই স্বাভাবিক গণ্য করেছিল। বিশ্বের অপরাপর রাষ্ট্রের নারীরাও তা মেনে নিয়েছিল।[১৫] ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে নারীরা সম্রাট ও বাদশাহদের রাণী, বেগম বা দাসী হিসেবে নির্যাতিত, পরাধীন ও ক্ষেত্র বিশেষে অত্যাচারিত জীবনযাপন করত। ফলে এটুকু অনুমেয় যে, প্রাচ্যের নারীদের জীবন খুব একটা সুখের ছিল না এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের নারীদের চাইতে কম বেদনাদায়ক ছিল না। প্রাচ্য সমাজে নারীর এ বেদনাদায়ক ও হীন অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য সমাজ সংস্কারক ও নারীবাদী চিন্তাবিদেরা নারী আন্দোলনের বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেন। নারী আন্দোলনের সূচনা হয় সমাজ সংস্কারের মধ্য দিয়ে। ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের সূচনা ঘটে ১৯৭৫ সালে এবং সমাপ্তি ঘটে ১৯০ বছর পরে। ইংরেজরা নিজেদের প্রয়োজনেই ভারতে পাশ্চাত্য ধারার শিক্ষার প্রবর্তন করেন। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে নব জাগরণের ফলে সমাজ সংস্কারের সূচনা হয়। এ সমাজ সংস্কারের মধ্যে ছিল সতীদাহ প্রথা রোধ, বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহ রোধ, কৌলিন্য প্রথা দূর করা, নারী শিক্ষার প্রসার ঘটানো ইত্যাদি।

নারী শিক্ষায় ব্রিটিশরা ভারতীয় উপমহাদেশে বিশেষ অবদান রাখেন। শুধুমাত্র ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সুবিধার্থে বিশেষ করে উচ্চ পদস্থ কর্মচারীদের বিচার ও শাসন বিভাগীয় সমস্যা লাঘব করার উদ্দেশ্যে কতগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রাচ্যে প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করে। এগুলোর মধ্যে ছিল কলকাতা মাদ্রাসা (১৭৯১) ও কলকাতা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ (১৮০০) ইত্যাদি। প্রথমদিকে নারীরা কোম্পানীর কর্মচারী হতে পারবে না বলে তাদের শিক্ষার কথা ইংরেজরা ভাবেনি। পরবর্তীতে অবশ্য নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা অনুভব করে ইংরেজ সরকার এগিয়ে আসে। ইস্ট

ইন্ডিয়া কোম্পানীর হাতে যতদিন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আসেনি (১৭৫৭) ততদিন কোম্পানী মিশনারীদের পৃষ্ঠপোষকতায় ধর্ম প্রচার ও শিক্ষা বিস্তারের কাজে সাহায্য করেছে। মিশনারী নারীরাই প্রথমে নারী ও পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে শিক্ষার আয়োজন করে।[১৬]

১৭০০ সালে জ্ঞান প্রচার সমিতির উদ্যোগে অনেকগুলো দাতব্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। যেমন– স্কুল ভবন নির্মাণের জন্য এককালীন অর্থ প্রদান, স্কুল ভবন মেরামতের অর্থ প্রদান, লটারীর সাহায্য অর্থ সংগ্রহ করে স্কুল চালু রাখার অনুমতি দেয়া ইত্যাদি। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী পরবর্তীতে মিশনারী নারীদের ধর্ম প্রচার ও শিক্ষা বিস্তারে ব্যাপক স্বাধীনতা দেয়। তাঁরা পুস্তক প্রকাশ, নারী শিক্ষার বিস্তার, অনাথ আশ্রম ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করে। এমনকি বাড়ি বাড়ি গিয়েও পর্দানশীল নারীদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার শুরু করে। কোম্পানীর এদেশীয় ব্যক্তিবর্গ মনে করলেন যে, আরবি ও সংস্কৃতি ভাষার মর্যাদা থাকলেও এতে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের সুযোগ কম। তাই রাজা রামমোহন রায়সহ প্রগতিবাদীরা (পাশ্চাত্যবাদী) প্রাচ্যে প্রচলিত শিক্ষার পরিবর্তে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি তাঁদের সমর্থন প্রকাশ করেন। তাঁরা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, প্রচলিত শিক্ষার পরিবর্তে ইংরেজী শিক্ষা ও বিজ্ঞানের প্রসার দ্বারা ভারতীয় উপমহাদেশে সত্যিকার উপকার সম্ভব হবে।[১৭]

ইংরেজদের নির্দেশনা অনুসরণ করেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মালোচনার প্রতিষ্ঠান, সংবাদপত্র, মুদ্রণযন্ত্র প্রভৃতি ভারতে স্থাপিত হয় এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি পর্যায়ে শিক্ষার সুযোগ আসে।

প্রাচ্যে নারী আন্দোলনের সূচনা পর্বে নারী সমাজের দুর্গতি দূর করার জন্য আন্দোলন শুরু হয়। নারী আন্দোলনকারীদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩), মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের (১৮২০-১৮৯১) নাম উল্লেখযোগ্য। রাজা রামমোহন রায় প্রথম প্রতিবাদ জানান নারীর ওপর সামাজিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে। সতীদাহ প্রথা বন্ধ করার জন্য তিনি ১৮১৫ সালে কলকাতায় বাংলা পত্রিকা প্রকাশ করেন। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে ব্যাপক জনমত গড়ে ওঠে। ফলশ্রুতিতে ১৮২৯ সালের ৪ ডিসেম্বর আইনসঙ্গতভাবে সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ হয়।[১৮] নারীসমাজ যেন নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয় সে উদ্দেশ্যে তিনি লেখালেখি করতেন। ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা ও রাজনীতি প্রভৃতিতে আধুনিক সংস্কারের লক্ষ্যে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেন, "সকলের স্ত্রী দাস্য বৃত্তি করে বা একজন নারী একাধারে রাঁধুনী, শয্যাসঙ্গিনী ও বিশ্বস্ত গৃহরক্ষী।"[১৯] পরবর্তীতে তিনি নারী

শিক্ষার প্রসারে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৮৩০ সালে তিনি ইংল্যান্ড ভ্রমণ করেন এবং নারী জাগরণের রূপ প্রত্যক্ষণ করেন। এ সময় তিনি ভারতীয় নারী সমাজের উন্নতির আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন। তাঁর প্রিয় দুই বন্ধু প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং প্রসন্ন কুমার ঠাকুর ১৮২৫ সালের মধ্যেই নারী শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৮২০ সালে ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর নেতা হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও নারীর সমমর্যাদার জন্য প্রচারণা শুরু করেন। এরপর আরো অনেকেই এগিয়ে আসেন যাঁদের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম উল্লেখযোগ্য। রাজা রামমোহন রায়ের পর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলার নারী সমাজের জন্য অবদান রাখেন। তাঁর উদ্যোগেই ঠাকুর পরিবার নারীর জন্য বিভিন্ন ভূমিকা পালন করেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে ১৮৫৬ সালের ২৬ জুলাই বিধবা বিবাহ আইন পাশ হয়। ১৮৫৬ থেকে ১৮৬৭ সাল পর্যন্ত সময়ে ষাটটি বিধবা বিবাহ তাঁর মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়। শুধু বিধবা বিবাহ প্রচলন নয়, বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহ বন্ধের জন্যও তিনি আন্দোলন করেন।

উনিশ শতকে ইংরেজ শাসন শুরু হলে শিক্ষা-দীক্ষা, চাকুরী, সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভের ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বড় ধরনের ব্যবধান তৈরি হয়। এ পর্যায়ে ইংরেজ প্রবর্তিত নারী শিক্ষার প্রতি মুসলমানদের অনাগ্রহ লক্ষণীয়। ফলে নারীর সার্বিক উন্নয়নে মুসলমানেরা পিছিয়ে পড়ে। অনেক বছর পর মুসলিম সমাজ ইংরেজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য বিদ্যা গ্রহণের মধ্য দিয়ে আধুনিক জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

মুসলিম সমাজে সামগ্রিকভাবে শিক্ষা আন্দোলন শুরু হওয়ার মধ্য দিয়ে নবজাগরণের শুরু হয়। অনেক দিনের প্রচলিত প্রথাকে ভাঙ্গার সাহস দেখান যাঁরা তাঁদের মধ্যে আব্দুল লতিফ (১৮১৮-১৮৯৩) ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'মোহামেডান লিটারেরী সোসাইটির' নাম প্রণিধানযোগ্য। এ চিন্তাবিদ নারী শিক্ষার জন্য জোর আন্দোলন করেন। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে পরবর্তী দুই শতকের মধ্যে বিবি তাহেরুন্নেসা, নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরী এবং করিমুন্নেসা খানম এ তিনজন নারীর আবির্ভাব ঘটে যাঁরা মুসলিম নারীকে অবরোধ প্রথা থেকে বের হয়ে আসার জন্য প্রথম আহ্বান জানান। উল্লেখ্য যে, নারী শিক্ষার বিরুদ্ধে তৎকালীন সময়ে ধর্মীয় প্রচারণা ও বিধি-নিষেধের প্রবল চাপ ছিল। সে প্রতিকূল অবস্থায় নারীর বিভিন্ন অবরোধ থেকে মুক্তি ছিল কষ্টসাধ্য বিষয়।

১৯৪৭ সালের পর পূর্ব পাকিস্তানে নারী শিক্ষায় বাধা যেমনঃ আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ করলে পর্দা বা ধর্ম থাকবে না, মেয়েদের বাল্যকালে বিয়ে দেয়ার মনোভাব থাকলেও শিক্ষার ধারা এগিয়ে চলে। নারীদের জন্য আলাদা স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা যেমন অব্যাহত থাকে, তেমনি সহশিক্ষার প্রথাও ক্রমশ জোরদার হয়। বর্তমানে শিক্ষার ক্ষেত্রে নারীর

পদচারণা সাবলীল হয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সহশিক্ষা পদ্ধতিতে ছাত্র ও ছাত্রীরা শিক্ষা গ্রহণ করছে। তা সত্ত্বেও সামাজিক ও অর্থনৈতিক কিছু বাধার জন্য নারী শিক্ষার হার এখনও অনেক কম। বাংলাদেশের নারী আন্দোলন নারী শিক্ষা প্রসারে গুরুত্ব দিচ্ছে। নারী আন্দোলনের অগ্রদূত রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন (১৮৮০-১৯৩২) নারী শিক্ষার জন্য বিশ শতকের শুরুতে যে আন্দোলন শুরু করেছিলেন তা ব্যাপকভাবে এনজিও, নারী সংগঠন ও সরকারের কর্মসূচিতে যুক্ত হলেও দেখা যাচ্ছে নারী শিক্ষার শতভাগ প্রসার ঘটছে না। এ নিয়ে নারী নেত্রীদের তেমন আন্দোলন নেই। তবে নারীর ক্ষমতায়ন প্রসঙ্গে নারী আন্দোলনে নারী শিক্ষার গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে।[২০]

রোকেয়ার সময়ে মুসলিম নারীর জীবনে পর্দা প্রথা নামে যে অবরোধ প্রথা চালু ছিল তাতে নারীশিক্ষা বিস্তার ব্যাহত হচ্ছিল। অবরোধ প্রথা দূরীকরণে রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। বিবাহের পর তাঁর স্বামী সাখাওয়াৎ হোসেনের সহায়তায় তিনি উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে সক্ষম হন এবং মুসলিম নারীদের পর্দা প্রথা মেনেই শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহ দেন, সাহায্য-সহযোগিতা করেন। অবরোধ প্রথা ভেঙ্গে বঞ্চিত নারীদের একত্রে উদ্বুদ্ধ হওয়ার অনুপ্রেরণা ও বিভিন্ন নির্দেশনা তিনি দিয়েছেন। স্কুল প্রতিষ্ঠার পর বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে ছাত্রী যোগাড় করা এবং 'আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম (১৯১৬)' নামে একটি নারী প্রতিষ্ঠান পরিচালনার মধ্য দিয়ে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত নারীর অবরোধ মুক্তির জন্য তিনি সমাজ সংস্কারের সাহসী ভূমিকা পালন করেছেন। এজন্য রোকেয়াকে মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত বলা হয়। সে সময় নারী সমাজের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা নানাভাবে অবদান রাখে। এসব পত্রিকার মধ্যে 'সওগাত' ও 'শিখা' পত্রিকার নাম উল্লেখযোগ্য।

প্রাচ্যের ভারতবর্ষের নারী আন্দোলনের একটি সফল প্রাপ্তি হল নারীর ভোটাধিকার অর্জন। ভোটাধিকার আদায়ের লক্ষ্যে ১৯২১ সালে 'বঙ্গীয় নারী সমাজ' গঠিত হয়। ১৯২১ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইন সভায় নারীদের ভোটের অধিকার ও অনুমোদিত হয়। ১৯৩৫ সালে ষাট লক্ষ নারীর ভোটাধিকার পাশ হয়। ১৯৪০ সালে ভারতীয় উপমহাদেশের নারীরা প্রথম ভোটাধিকার প্রয়োগ করে। ঐ বছর রাজ্য পরিষদ, কেন্দ্রীয় পরিষদ ও কেন্দ্রীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন অনুমোদিত হয়। রাজ্য পরিষদে ১৫০ আসনে ৬ জন ও কেন্দ্রীয় আসনে ২৫০ জনের মধ্যে ৯ জন নারীর প্রবেশাধিকার বাস্তবায়িত হয়।[২১] রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন সক্রিয় রাজনীতিতে অংশ না নিলেও রাজনৈতিক সচেতনতা নিয়ে নারী সমাজকে স্বদেশী আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হতে আহ্বান জানান। উল্লেখ্য, ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ হয় এবং এর

বিরুদ্ধে স্বদেশী আন্দোলন গড়ে উঠে। ১৯০৫ থেকে ১৯০৮ সালে স্বদেশী আন্দোলনে নারীরা অংশ গ্রহণ করে। ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হলে, মুসলিম নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের আগ্রহ বাড়ে।

নারী আন্দোলনের এ পর্যায়ে এসে ভারতবর্ষে উদ্ভব ঘটে নারী সমিতি ও সংগঠনের। ১৯৪৩ সালে অবিভক্ত বাংলায় দেশরক্ষা, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর হাত থেকে সমাজজীবন রক্ষার তাগিদে বৃহত্তম দেশ প্রেমিক নারীদের সংগঠন গড়ে ওঠে। এসব সংগঠনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'।[২২] ১৯৩৯ সালে যখন সমগ্র ইউরোপে ফ্যাসিস্ট তৎপরতায় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ শুরু হয়; তখন এর অশুভ প্রভাব প্রাচ্যেও পড়ে। ফলে নারী ও শিশুরা বিভিন্ন অসুবিধার সম্মুখীন হয়। নারী সংগঠন 'মহিলা আত্মরক্ষা কমিটি' দৃঢ়তার সাথে এসব সমস্যা মোকাবিলা করে। এ সময়ে ভারতে স্বদেশী আন্দোলনের সাথে নারী আন্দোলন যুক্ত হয়। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলাম বিভিন্ন কবিতা ও গান রচনা করে, আবৃত্তি ও গেয়ে নারী সমাজকে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন এবং নারীর মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য কাজ করেছেন। এ সময় সামাজিক ব্যাধি 'যৌতুক প্রথা' দূর করার জন্য ব্যাপক আন্দোলন হয়।

ভারতবর্ষ ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসনের অবসান হয়ে ভারত ও পাকিস্তান দু'টি রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়। পাকিস্তান আমলের নারী আন্দোলনকারীরাও সমাজ সংস্কারে এগিয়ে আসেন। নারী আন্দোলনের এ পর্যায়ে বিবাহ সংক্রান্ত আইনের বড় ধরনের সংস্কারের প্রস্তাব দেয়া হয়। ১৯৪৮ সালে ৮ নভেম্বর প্যারিসে অনুষ্ঠিত জাতি সংঘের সভায় সর্বপ্রথম বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ সংক্রান্ত তিনটি সামাজিক কুপ্রথা রোধের সুপারিশ করা হয় :

ক) বাল্য বিবাহ রোধ করা।

খ) উভয় পক্ষের সম্মতিহীন বিবাহ রোধ করা।

গ) বিবাহ বিচ্ছেদের পর নারীর মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখা ও সম্পত্তির নিরাপত্তার অভাব দূর করা।

প্রাচ্যের সমাজব্যবস্থায় এক্ষেত্রে আইন নারীর অনুকূল ছিল না। সমাজ সংস্কার এবং নারী উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতা দূর করার লক্ষ্যে যে সব উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় তা বাস্তবায়নে নারী আন্দোলনকারীদের অনেক কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে ও সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

পাকিস্তান ও ভারত বিভক্ত হওয়ার পর পূর্ব পাকিস্তানের অনেক হিন্দু ভারতে চলে যায়। তৎকালীন সময়ে শিক্ষাকেন্দ্রগুলোতে শিক্ষার্থীর অভাব পরিলক্ষিত হয়। সে সময়ে বাংলাদেশের প্রথম নারী রাজনীতিবিদ জোবেদা খাতুন চৌধুরী, সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস্ স্কুলের শিক্ষার্থীবৃন্দ, 'আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম' সমিতির সদস্যবৃন্দ, রোকেয়ার আদর্শ অনুসারী শামসুন্নাহার মাহমুদ (১৯০৮-১৯৬৪), আনোয়ারা বাহার চৌধুরী, সুফিয়া কামাল, মেহেরুন্নেসা ইসলাম প্রমুখ ঢাকার রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ লীলা নাগের নেতৃত্বে নারী শিক্ষায় নিবেদিত হয়েছিলেন।

১৯৪৭ সালে রক্ষণশীল নারী সংগঠনের কর্মসূচি নারীর সাংসারিক ভূমিকা পালন, রান্না, শিশুপালন ও শূচী শিল্পের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তীতে সরকারের শিক্ষানীতিতে নারীদের জন্য নির্দিষ্ট শিক্ষানীতি প্রণীত হয়। ভাষা আন্দোলনের আদর্শ থেকে নারীসমাজ নিজেদের অধিকার সম্বন্ধেও সচেতন হয়। সে সময় প্রগতিশীল দলের পাশাপাশি রক্ষণশীল দলগুলোও নারীদের নিজস্ব দল গঠনে জোর দেয়। আনোয়ারা খাতুন, নুরজাহান মুরশিদ, দৌলতুন্নেছা খাতুন, বদরুন্নেসা আহমেদ, সেলিনা বানু, রাজিয়া বানুসহ অনেকে যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হয়ে ১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তানের গণপরিষদে নির্বাচিত হন। এ সময়ে নারী আন্দোলনের কর্মসূচির মধ্যে রাজনৈতিক অধিকার বিষয়টি ছিল অন্যতম। নারী আন্দোলনকারীরা খাদ্যের অভাব ও দ্রব্য মূল্যের প্রতিবাদে মিছিল বের করে। নারীসমাজ অর্থনৈতিক মুক্তি ও জীবিকা অর্জনের জন্যও সচেতন হয়ে ওঠে এবং এ সংক্রান্ত আন্দোলনে অংশ নেয়।[২৩] এ প্রসঙ্গে মালেকা বেগম উল্লেখ করেন যে,"বিশ শতকের নারী আন্দোলনে শিক্ষিত নারী সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্যভাবে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। শিক্ষার ফলে জীবন ও মূল্যবোধ সম্পর্কে নতুন ধারণা নিয়ে তাঁরা নারীসমাজকে সংগঠিত করতে থাকেন। স্বামী ও শ্বশুর বাড়ির সাথে নারীর সম্পর্ক, পরিবার, সংসার ও সমাজে নারীর ভূমিকা সম্পর্কে এই সময় নারীসমাজ নতুনভাবে ভাবতে থাকে। প্রচলিত সামাজিক-পারিবারিক ধ্যান-ধারণায় বিশ্বাসী নারী ও পুরুষ এই যুগের সচেতন নারীসমাজকে সমালোচনা করতে থাকেন। তবে উনিশ শতক ও বিশ শতকের শুরুতে নারীদের কিছু সংস্কারমূলক অধিকারের উদ্যোগে পুরুষ নেতৃত্ব নিয়েছিলেন। আবার বিশ শতকে নারীসমাজ সচেতন হয়ে যখন পুরুষ আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ করে তখন নারী মুক্তি আন্দোলন বাধাগ্রস্ত হয়।"[২৪]

নারী আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ১৯৬৯ সালে গঠিত হয় 'মহিলা সংগ্রাম পরিষদ'। পরবর্তীতে এ সংগঠন 'পূর্ব পাকিস্তান মহিলা পরিষদ', আর বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর নাম হয় 'বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ'। স্বাধীনতার পর এ সংগঠনের

পাশাপাশি অন্যান্য সংগঠন হল 'মহিলা সমিতি', 'মহিলা কর্মজীবী ক্লাব', 'ইউনিভার্সিটি উইমেন্স ফেডারেশন' প্রভৃতি সংগঠন বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে নারীর অধিকার ও মর্যাদার বিষয়ে ভূমিকা রাখছে।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বে পাকিস্তানে ইসলামী রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কুরআনের ব্যাখ্যার আলোকে বিভিন্ন আইন প্রণীত হয়েছিল যা ছিল কুরআনের ভুল ব্যাখ্যা ও নারীর বিপক্ষে। প্রণীত আইনগুলো নারী ও অমুসলমানদের প্রতি বৈষম্যমূলক ছিল। এজন্য নারীবাদী বিভিন্ন উন্নয়নমূলক সংস্থাকে দীর্ঘদিন সংগ্রাম করতে হয়েছে। বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে লাহোর WAF (Women Action Forum) অন্যতম। প্রাচ্যের রাষ্ট্র পাকিস্তানের তথাকথিত ইসলামিক আইন নারীদেরকে দ্বিতীয় শ্রেণীর মর্যাদা দিয়েছে।[২৫] রাজনৈতিক অধিকারের প্রশ্নেও নারী বৈষম্যের শিকার হয়েছে। নারীর প্রতি বৈষম্যের বিষয়টি এরূপ যে, একইভাবে নারী ও পুরুষের যে কোন শারীরিক ক্ষতির জন্য কিংবা যে কোন রকম ক্ষতি পূরণের ক্ষেত্রে একজন ক্ষতিগ্রস্ত অথবা পঙ্গু নারী বিচার পাবেন একই রকম ক্ষতির জন্য একজন পুরুষ যা বিচার পাবেন তাঁর অর্ধেক।"[২৬] এ অন্যায় বিষয় গ্রহণযোগ্য নয়। পরবর্তীতে নারী আন্দোলনকারীরা এবং নারী সংস্থাগুলো নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টানোর এবং আইনের বৈষম্যমূলক ধারা পরিবর্তনের প্রতি সচেতন হন এবং সে লক্ষ্যে আন্দোলন করেন। নারী আন্দোলনকারীরা সাক্ষ্যআইন, শরিয়াআইন, কিয়াস ও দিয়াত আইনের ত্রুটিসমূহ তুলে ধরেন এবং কুরআনের লিঙ্গভিত্তিক অবৈষম্যমূলক ব্যাখ্যা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে উল্লেখ করে ন্যায়বিচারের দাবী তুলে ধরেন। উল্লেখ যে, WAF (Women Action Forum) ও অন্যান্য সাহায্যকারী সংস্থা বিভিন্ন অত্যাচার ও অনৈতিক আইনের প্রতি সোচ্চার হয়েছে। এ সংগঠনের আন্দোলনে একতা ছিল এবং সিদ্ধান্ত ছিল আন্দোলনকে শক্তিশালী করা।[২৭] পাকিস্তানের মুসলিম-ই-সূরার নারী সংক্রান্ত বিষয়কে নারী আন্দোলনকারীরা চ্যালেঞ্জ করেন এবং সাধারণ নারীরা WAF এর ব্যাখ্যা সমর্থন করেন। নারীসমাজ যে পুরুষের চেয়ে নিকৃষ্ট নন, তাঁরাও যে বিচার কার্যে সাক্ষ্য দিতে পারেন, যুদ্ধে যেতে পারেন, বিচারক হতে পারেন এমন আরো কর্ম যা করতে পারেন নারীরা তার পক্ষে হাদিস হতে বিস্তারিত উদ্ধৃতিসহ মজলিসে বক্তব্য রাখেন। পাকিস্তান সমাজব্যবস্থায় অবৈধ সম্পর্ক, ধর্ষণ, ব্যাভিচার, গর্ভপাত ইত্যাদি ঘটনার সাথে যুক্ত নারীকে সাজা দেয়ার প্রবণতা লক্ষণীয়। চারজন পুরুষ ব্যক্তির চাক্ষুষ সাক্ষী যদি মেলে তবে দায়ী ব্যক্তির সাজা হতে পারে। এক্ষেত্রে নারী কিংবা অমুসলিম ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণীয় নয়।

WAF ও অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক পিকেটিং, অবস্থান ধর্মঘট, ঘেরাও কর্মসূচি ও মিটিং, প্রতিবাদ মিছিল, সেমিনার ইত্যাদি বিভিন্ন কর্মসূচি মধ্য দিয়ে নারীর অধিকার ও

নানা বৈষম্য দূর করতে সচেষ্ট হয়েছে। এসব আন্দোলনে ছাত্রী, চাকুরীজীবী, গৃহিনী, সমাজের সবস্তরের নারী অংশগ্রহণ করেছে এবং সমর্থন জানিয়েছে।

পাকিস্তানের নারী আন্দোলন কর্মসূচির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল জীবনের সর্বক্ষেত্রে নারীর অধিকার নিশ্চিত করা, অফিসের প্রধান পদে যোগ্য নারীকে নিয়োগ দেয়া, নারী ও পুরুষের মধ্যে আইনগত সমতা থাকা ইত্যাদি। মসলিস-ই-সূরায় (নির্বাচিত পরিষদ) নারীদের পদ নিশ্চিত করা এবং নারীর ওপর আরোপিত অযৌক্তিক শর্ত বাতিল করা, নারীদের ভোটদানের ব্যাপারে সচেতন করা, শরিয়া ভিত্তিক আইন বর্জন করা, সামাজিক বৈষম্য ও অত্যাচারের শাসনতান্ত্রিক বৈধতা দূর করা। নারীসমাজের জন্য ক্ষতিকারক বাল্য বিবাহ রেজিস্ট্রেশন আইন (১৯২৯), মুসলিম বিবাহ ও সম্পত্তি আইন (১৯৩৯) এবং পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ (১৯৬১) বাতিলের বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়। ইসলামী কাঠামোর মধ্যেই নারীর পক্ষে মূল্যবান যুক্তি থাকায় শিক্ষিত, জ্ঞানী পণ্ডিত ও পুরুষ সদস্যরা নারী আন্দোলনকারীদের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। WAF নারীবাদী নেত্রী আসমা জাহাঙ্গীরের নাম এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।[২৮]

প্রাচ্যের অন্যান্য রাষ্ট্রের মত চীনা সমাজেও অনেক নির্মম ও অত্যাচারের শিকার হয়েছিল নারী। ১৯১৯ সালে মে মাসে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন হয় ফলে নারীর রাজনৈতিক সংযুক্তিও বাড়তে থাকে।[২৯]

চীনা সমাজে নারী অধঃস্তনতার আদর্শ হিসেবে কনফুসিয়াসের মতাদর্শকে যৌক্তিক মনে করা হত। পরবর্তী সময়ে নারীর অধঃস্তনতা সম্পর্কিত কনফুসিয়াসের অন্তর্ভুক্ত করা মতাদর্শের বিরোধিতা করা হয়। চীন বিপ্লবের সাথে নারী মুক্তির প্রসঙ্গটিও তাই চলে আসে। নারী মুক্তির জন্য বিক্ষোভ, প্রতিবাদ মিছিলও করা হয়। জাতীয় পর্যায়ে ১৯১১ সালের আন্দোলনে কিউজিন নামে এক নারী শহীদ হন। পরে তিনি বিপ্লবী নারীর প্রতীকে পরিণত হন।[৩০]

পরবর্তীতে যে চীনা গণতান্ত্রিক আন্দোলন হয় তাতে নারী অধিকার সম্পর্কিত বিভিন্ন কর্মসূচি ছিল। চীনা সমাজে নারীর প্রতি নিকৃষ্ট মনোভাব পোষণ করায় নারীকে ব্যক্তি হিসেবে নিজের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন এবং তা বাস্তব সমাজে প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ছিল কঠিন। চীনের বিপ্লবী আন্দোলনে যে লং মার্চ হয় তা নারী আন্দোলনের সাথে অভিন্ন ছিল না। এ বিপ্লবী আন্দোলনে অনেক দাবী উত্থাপিত হয়েছিল যা নারীর আত্মবিশ্বাস অর্জনে সহায়তা করেছে। কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচিতে নারী বিষয়ক অনেক দাবী অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং এ আন্দোলনে নারী অংশ গ্রহণ করে। কমিউনিস্ট পার্টি ক্ষমতা গ্রহণের পর ১৯৫০ সালে নতুন বিবাহ আইন করে যা নারীর অধঃস্তনতার আইনগত

ভিত্তি ভেঙ্গে দেয়। সম্পত্তি, বিবাহ বিচ্ছেদ ও সন্তানের ওপর নারী সমান অধিকার লাভ করে। এ আইনে পরিবারে নারী ও পুরুষের মধ্যে দায়িত্বও সমানভাবে নির্ধারিত হয়। [৩১] চীনের অর্থনৈতিক কাঠামোর সংস্কারের সঙ্গে নারী বিষয়ক সংস্কার করে আইন কার্যকরী করা হয়। চীনে কমিউন ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর 'চীনা নারী ফেডারেশন' নারীর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দাবী আদায়ে সংগ্রাম করেছে। ফলে নারী মুক্তির বৈষয়িক ও আইনগত ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং শিল্প ও সেবা প্রতিষ্ঠানের আইন নারীর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সহজতর হয়। উদাহরণস্বরূপ, শিশুযত্ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, প্রসূতিকালীন ছুটি, সম মজুরী সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯৫৮-৬০ সালের মধ্যবর্তীতে নারীদেরকে সমবায় কার্যে জড়িত করা হয় এবং গার্হস্থ্য কর্মগুলো সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পাদনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।[৩২] চীনা সমাজে মতাদর্শিক লড়াই, মত প্রকাশ, বিতর্ক ও সমালোচনা গুরুত্ব পায় বলে বিপ্লব উত্তর চীনা সমাজে নারী সংক্রান্ত বিভিন্ন সমালোচনা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ফলশ্রুতিতে, নারীর অধিকারের বিষয়গুলো বাস্তবায়ণের গুরুত্ব পায়। এসময় নারীর জীবনযাত্রার আধুনিকীকরণ ঘটে। পোষাক-পরিচ্ছদ, সাজসজ্জা ইত্যাদি দৈনন্দিন বিষয়ে পরিবর্তন আসে। একই সাথে বৃদ্ধি পায় দুর্নীতি, পতিতাবৃত্তি ও পর্নোগ্রাফী। নারী মুক্তি কর্মসূচির পশ্চাদপদতা দূর করার লক্ষ্যে নতুন করে চীনা নারী সংগঠনগুলো আন্দোলন অব্যাহত রেখেছে।

এভাবে প্রাচ্যে নারী আন্দোলনের গতিধারা অব্যাহত রয়েছে এবং নারীর ক্ষমতায়ন, অধিকার বাস্তবায়ন ও সমতা আনয়ণের লক্ষ্যে প্রাচ্যের প্রতিটি রাষ্ট্রে জাতীয় পর্যায়ের নারী উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। বলা যায়– এভাবে প্রতিটি রাষ্ট্রের সংবিধানে নারী অধিকার নিশ্চিত করার চেষ্টা চলমান রয়েছে।

১.৩ পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের নারী আন্দোলনের মধ্যে সম্পর্ক এবং এর দার্শনিক মূল্যায়ন

পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যে নারীর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় অভিন্ন হওয়ার ফলে উভয় পরিমণ্ডলের নারী আন্দোলনের মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে। প্রথমে আমি পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের নারী আন্দোলনের সাদৃশ্য তুলে ধরছি। এর সঙ্গে নারী উন্নয়ন, নারী বিষয়ক চিন্তা ও কর্মে এ আন্দোলনের মূল্য বিশ্লেষণ করছি।

(১) পাশ্চাত্যে নারী আন্দোলনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল সমাজে পশ্চাৎপদ নারীর অবস্থানের পরিবর্তন করা। আর এজন্য নারীর প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের জন্য পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উভয় ক্ষেত্রে আন্দোলন অব্যাহত ছিল। তেমনিভাবে প্রাচ্যের নারী আন্দোলনেরও উদ্দেশ্য ছিল পাশ্চাত্যের মতো সমাজের পশ্চাৎপদ নারীর অবস্থান সুদৃঢ় করা। অর্থ্যাৎ প্রাচ্যের পশ্চাৎপদ নারীর প্রতি সামাজিক ও

দৃষ্টিভঙ্গিগত পরিবর্তন আনা। আর এ লক্ষ্যে সমাজে বিভিন্ন প্রথা ও সংস্কার দূরীকরণের জন্য বিভিন্ন চিন্তাবিদ, সমাজ সংস্কারক ও নারী নেতৃবৃন্দ কাজ করেছেন। দার্শনিক দৃষ্টিকোণ হতে এ ধরনের কর্ম ন্যায়সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত। কেননা সমাজের মঙ্গলের জন্য প্রচলিত প্রথা ও সংস্কার দূর করা প্রয়োজন।

(২) পাশ্চাত্যে নারী আন্দোলনকারীরা পাশ্চাত্য সমাজে নারীর বিরুদ্ধে পুরনো মূল্যেবোধ ও ধর্মীয় অনুশাসন দূর করার লক্ষ্যে কাজ করেছেন তেমনি প্রাচ্যের নারী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দকেও প্রাচ্য সমাজের নারীর বিরুদ্ধে পুরনো মূল্যবোধ ও ধর্মীয় অনুশাসন দূর করার জন্য তৎপর হতে হয়েছে। উভয় ক্ষেত্রের নারী নেতৃবৃন্দের এরূপ কর্মতৎপরতা নারীবাদী দার্শনিক কার্যক্রমের আওতাভুক্ত; সে জন্য এর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।

(৩) পাশ্চাত্যে সতের শতকে নারী উন্নয়নের জন্য নারী শিক্ষার ওপর জোর দেন আন্দোলনকারীরা, বিশেষত নারীর উচ্চ শিক্ষার দাবীর পক্ষে তাঁরা মত প্রদান করেন। সেরূপ প্রাচ্যের ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসক কর্তৃক প্রথম নারী শিক্ষা চালু করা হয়। মিশনারী নারীরাই ভারতবর্ষে প্রথম নারী ও পুরুষ নির্বিশেষে সবার জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করেন যদিও মিশনারীদের শিক্ষা কার্যক্রম শুরুর আগেই ভারতবর্ষে পুরুষদের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল তথাপি নারী উন্নয়নের জন্য শিক্ষা অপরিহার্য বিষয় বলে প্রাচ্যের নারী আন্দোলনকারীরাও নারী শিক্ষার ওপর জোর দেন। শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে নারী আন্দোলনকারীদের এ অবদান বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী।

(৪) পাশ্চাত্যের নারীবাদের প্রবর্তক মেরি ওলস্টোনক্র্যাফ্ট সহ অন্যান্য নারী নেতৃবৃন্দ অবহেলিত নারীর শিক্ষা সহ মৌলিক অধিকার বাস্তবায়নের জন্য চিন্তা করেছেন ও বিভিন্ন কর্মে নিজেদের নিয়োজিত রেখেছেন। তদ্রুপ প্রাচ্যের ভারতবর্ষের নারী জাগরণের অগ্রদূত রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনও নারী শিক্ষা বিষয়ে চিন্তা করেছেন এবং সে জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ ও কাজ করেছেন। এ লক্ষ্যে তিনি স্কুল স্থাপন করেছেন। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যে নারী আন্দোলনে এ দুজন নারীবাদীর চিন্তা ও কর্ম কল্যাণ দর্শনে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। তাঁদের উভয়ের কর্ম তৎপরতা নারী আন্দোলনে যুক্ত হয়ে নারীর মৌলিক অধিকার বাস্তবায়নে সাহায্য করেছে।

(৫) পাশ্চাত্যের উপযোগবাদী দার্শনিক জন স্টুয়ার্ট মিল তাঁর *Subjection of Women (1869)* গ্রন্থে নারীর শোচনীয় অবস্থা তুলে ধরেছেন এবং নারী অধিকার বাস্তবায়নের জন্য তৎপর হয়েছেন। তেমনি প্রাচ্যের সমাজসংস্কারক রাজা রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ করেন ১৮২৯ সালে আইন পাশের মাধ্যমে। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য অনেক চিন্তাবিদের কর্মতৎপরতা নারী আন্দোলনের ধারাকে বেগবান করতে সাহায্য করেছে। সমাজ সংস্কারে তাঁদের অবদান অপরিসীম।

(৬) ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় নারীর প্রতি পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি বজায় ছিল। সেজন্য নারীকে কম মজুরী দেয়া হত। তদ্রুপ ভারত, পাকিস্তান ও চীনেও নারীর প্রতি পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। এ পুরুষতান্ত্রিক ও নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের জন্যও উভয় পরিমণ্ডলের নারী আন্দোলনকারীদের সংগ্রাম করতে হয়েছে। বিভিন্ন বিদ্রুপ পূর্ণ আচরণ, কটুক্তি ও অত্যাচার তাঁদেরকে সহ্য করতে হয়েছে। দার্শনিক বিচারে এ দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন একটি বড় বিষয়। কারণ দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন না হলে আন্দোলনে সফলতা অর্জন করা যায় না। সে জন্য তাঁদের এ কর্মকাণ্ড ছিল যৌক্তিক।

(৭) পাশ্চাত্যে নারী আন্দোলনের কর্মসূচিতে নারীর ভোটাধিকার আদায়ের লক্ষ্যে বিশেষ পদক্ষেপ নিতে হয়েছিল। রাজনৈতিক অধিকার বাস্তবায়নের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার ফলে নারী ভোট প্রদানে সক্ষম হয়। তেমনি প্রাচ্যের ভারত, পাকিস্তান ও চীনেও নারী আন্দোলনের কর্মসূচিতে ভোটাধিকার যুক্ত হওয়ায় নারীর ভোটাধিকার অর্জন সম্ভব হয়। উভয় পরিমণ্ডলে এ জন্য নারী নেতৃবৃন্দকে বিশেষ দুর্ভোগ সহ্য করতে হয়েছে। নারীর অধিকার বাস্তবায়নে নারী নেতৃবৃন্দের এ কর্মযজ্ঞ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে যার মূল্যও অপরিসীম।

(৮) পাশ্চাত্য আন্দোলনকারীরা নারীর বিবাহ, সন্তানের অভিভাবকত্ব, সম্পত্তির অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে কাজ করেছেন। তদ্রুপ প্রাচ্যেও আন্দোলনকারীদের বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহ রোধ, বিধবাবিবাহ চালু, বিবাহবিচ্ছেদ, সন্তানের অভিভাবকত্ব, সম্পত্তিতে নারীর অধিকার প্রাপ্তির জন্য পুরনো আইন সংস্কার ও নতুন আইন প্রণয়নের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ ও কর্মসূচি গ্রহণ করতে হয়েছে যা নারী সমাজের কল্যাণ সাধন করেছে। সুতরাং বলা যায় যে, নারী আন্দোলনকারীদের চিন্তা ও কর্ম ছিল যৌক্তিক ও সময়োপযোগী।

(৯) পাশ্চাত্যে বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলনের মাধ্যমে কৃষ্ণাঙ্গ নারী ও পুরুষ উভয়ের নাগরিক অধিকার আদায় করতে সচেষ্ট হয়। রোজা পার্ক কৃষ্ণাঙ্গ নারীদের অধিকার আদায় করেছেন ঠিক তেমনিভাবে ভারতবর্ষে বর্ণবাদ না থাকলেও হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত জাতিভেদ প্রথা দূর করে সকল হিন্দু নাগরিকের অধিকার আদায়ের জন্য সমাজসংস্কারক ও সচেতন ব্যক্তিবর্গের সংগ্রাম করতে হয়েছে। হিন্দু নারীদের পৃথক গোত্রের সাথে বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। বিধবাদের পুনরায় বিয়ে হতো না। পৃথক গোত্রে বিয়ে ও বিধবা নারীর পুনরায় বিয়ের ব্যাপারে নারী আন্দোলনকরীরা তৎপর হয়েছেন এবং সে মোতাবেক কাজ করেছে। এক্ষেত্রে সমাজসংস্কারক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁদের নারীবাদী চিন্তা নারী সমাজের উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। দার্শনিক বিচারে এর মূল্য অপরিসীম।

(১০) পাশ্চাত্যে নারী আন্দোলনকারীরা নারী ও পুরুষের সম অধিকার প্রতিষ্ঠা, নারীর কাজের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও শ্রমের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য সংগ্রাম করেছেন। জার্মান নারীনেত্রী ক্লারা জেটকিন নারীর শ্রমঘণ্টা কমানোর জন্য আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন। ১৯০৮ সালের ৮ মার্চ ৮ ঘণ্টা শ্রমের দাবীর জন্য কয়েকজন নারী নিহত হন। বর্তমানে ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে। ঠিক তেমনি প্রাচ্যের রাষ্ট্র চীনেও নারীর অধিকার ও মুক্তির জন্য বিভিন্ন বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ হয়। বিভিন্ন বিপ্লবের মধ্য দিয়ে জাতীয় নারী আন্দোলন যা ১৯১১ সালে সংগঠিত হয়। এ আন্দোলনে একজন নারী শহীদ হয়েছিল। চীনে কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তেহারে অনেক নারী স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। চীনে শাসন ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক সংস্কারের পাশাপাশি নারীর আইন সংস্কারের প্রস্তাব পাশ করা হয়। চীনেও নারী ও পুরুষের অসমতা দূর করার জন্য নারীবাদীরা সংগ্রাম করেছেন। 'চীনা নারী ফেডারেশন' সমাজে নারীর অধঃস্তনতা দূর করে নারীর অবস্থান সুদৃঢ়করণসহ অধিকারভোগ ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে। সমাজ পরিবর্তনের সাথে নারীর উন্নয়নে নারী আন্দোলনকারীদের এ অবদান মানবাধিকার দর্শনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

(১১) আঠার ও উনিশ শতকে পাশ্চাত্যে ও প্রাচ্যে উভয় ক্ষেত্রে নারী আন্দোলনে নারী মুক্তির বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে পুরুষের প্রাধান্য লক্ষ করা যায় কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্যে ও প্রাচ্যে নারী উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে পুরুষের প্রাধান্য হ্রাস পেয়ে নারীনেতৃবৃন্দ ও চিন্তাবিদের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে সমাজসংস্কার ও উন্নয়নে বিশেষ করে নারী বিষয়ক কর্মকাণ্ডে নারী ব্যক্তিত্বের চিন্তাভাবনা ও অগ্রগতি প্রকাশ পেয়েছে।

যাহোক, পাশ্চাত্যে ও প্রাচ্যের সমাজব্যবস্থা পৃথক হওয়ায় নারী আন্দোলনের কর্মসূচিতে কিছুটা ভিন্নতাও পরিলক্ষিত হয়– যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

(ক) বিশ শতকের নারী আন্দোলনকারীদের পর্দাপ্রথার অযৌক্তিকতা তুলে ধরে তা অপসারণের জন্য কাজ করতে হয়েছে। এক্ষেত্রে নারী জাগরণের অগ্রদূত রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনের নাম পূর্বেই উল্লেখ করেছি কিন্তু পাশ্চাত্য সমাজে পর্দা প্রথা না থাকায় ঐ সংক্রান্ত বিষয়ে নারী আন্দোলনকারীদের কোন পদক্ষেপ নিতে হয়নি।

(খ) ভারতবর্ষের নারী আন্দোলনে 'যৌতুক প্রথা' রোধ করার জন্য আন্দোলনকারীদের বিভিন্ন উদ্যোগ নিতে হয়েছে ও সে মোতাবেক কাজ করতে হয়েছে কিন্তু পাশ্চাত্য নারী আন্দোলনকারীদের এ সম্পর্কীয় বিষয়ে কোন কর্মসূচি নিতে হয়নি।

(গ) রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ ভারত ও পাকিস্থান দুটি পৃথক রাষ্ট্রে বিভক্ত হওয়ায় এ সময়ে নারী আন্দোলনকারীরা নারীর রাজনৈতিক অধিকার বাস্তবায়নের

লক্ষ্যে এ সংক্রান্ত কর্মসূচির প্রতি জোর দেন। ফলশ্রুতিতে ভাষা আন্দোলনে নারী সমাজ সম্পৃক্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু পাশ্চাত্য নারী আন্দোলনকারীদের এরূপ বিশেষ রাজনৈতিক ইস্যু নিয়ে কাজ করতে হয়নি।

(ঘ) প্রাচ্যের পাকিস্তান রাষ্ট্রের নারী বিষক আইনগুলো কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে প্রণীত হওয়ায় তা নারীর অনুকূলে বেশি কাজ করতে পারেনি। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য নারী বিষয়ক জাতীয় আইনগুলো কুরআন ও হাদীসের আলোকে প্রণীত না হওয়ায় তা মুসলিম নারীর প্রতি বেশি প্রতিবন্ধকতা করতে পারেনি।

সমাজ বিকাশের ধারার সাথে নারী আন্দোলনের একটা যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। ভিন্ন সমাজ, পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক সমস্যার উদ্ভব হয়। তখন ঐ সমস্যাটির সমাধান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে আন্দোলনকারীদের জন্য। যেমন বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থায় বর্তমানে নারী ও শিশু হত্যা এবং ধর্ষণ অপরাধ প্রকট আকার ধারণ করেছে। নারী ও শিশু হত্যা এবং ধর্ষণের মত জঘন্য অপরাধ রোধ কল্পে নারী আন্দোলনকারীদের বড় ভূমিকা রয়েছে। পূর্বের নারী আন্দোলনে দেখা গেছে, আন্দোলনকারীদের বিভিন্ন দাবির প্রেক্ষিতে সরকার নারীর জন্য নতুন নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। তদ্রুপ বর্তমান নারী ও শিশু হত্যা ও ধর্ষনের মত গর্হিত কর্ম রোধের জন্য নতুন আইন রাষ্ট্রের প্রণয়ন করা উচিত। আর এ জন্য নারী আন্দোলন কারীদের কর্ম তৎপরতা অব্যাহত রাখা আবশ্যক। সমাজে অন্যায় কারীদের উপর্যুক্ত শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য এহেন আন্দোলনের প্রভাব ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। আর এ আন্দোলনে যদি দার্শনিক সত্য, শুভ ও মঙ্গলের দিকনির্দেশনা যুক্ত হয় তাহলে তা হবে সমাজের জন্য অধিকতর কল্যাণকর।

উপসংহার

পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যে নারী আন্দোলনের গতি অব্যাহত রাখা তথা সমতা, উন্নয়ন এবং শান্তির লক্ষ্যে জাতিসংঘ নারী দশক ঘোষণা করেছিল। জাতিসংঘ নারী দশকের গৃহীত কর্মসূচির সাফল্যের পর্যালোচনা ও মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে নাইরোবিতে ১৯৮৫ সালে বিশ্ব নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। উক্ত অনুষ্ঠানে নারীর অগ্রগতির লক্ষ্যে নাইরোবি ভবিষ্যৎমুখী কর্মকৌশল গ্রহণ করা হয়। ১৯৯৫ সালে জাতিসংঘের উদ্যোগে বেইজিং-এ অনুষ্ঠিত হয় ৪র্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন। সে সময় জাতিসংঘে গৃহীত হয় বেইজিং+১০ পরবর্তী নারী বিষয়ক পদক্ষেপ। বিশ্ব মানবাধিকার সম্মেলন স্বীকার করেছে যে, নারী এবং কন্যা সন্তানের মানবাধিকার সর্বজনীন মানবাধিকারের একটি অবিচ্ছিন্ন, অখণ্ড ও অবিভাজ্য অংশ। আন্তর্জাতিক, জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক,

সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনে নারীর পরিপূর্ণ ও সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং নারী ও পুরুষ ভিত্তিক সবরকম বৈষম্য বিলোপ সাধন করা আন্তর্জাতিক সম্মেলনের উদ্দেশ্য। জাতিসংঘ সনদে, মানবাধিকার সম্পর্কিত বিভিন্ন বিধান এবং আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী সকলের মানবাধিকার ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করা, মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ করা এবং এগুলোর প্রতি সর্বজনীন সম্মানবোধ জাগ্রত করা ইত্যাদির ব্যাপারে সকল রাষ্ট্রের কর্তব্য পালনের অঙ্গীকার করা হয়েছে।[৩৩]

পরিশেষে এ কথা বলা যায় যে, এসব আন্দোলনের মূল লক্ষ্য হলো নারীর স্বাধীনতা ও অধিকার ভোগ নিশ্চিত করা, যাতে নারী নিজস্ব মেধা ও যোগ্যতা অনুসারে কর্ম সম্পাদনে সক্ষম হয়। বিভিন্ন সৃজনশীল কর্মের মাধ্যমে নারীর প্রতিভার বিকাশ ঘটানো সম্ভব হলে মর্যাদাবান ব্যক্তি হিসেবে সমাজ ও রাষ্ট্রে স্বীয় প্রতিষ্ঠা লাভ করতে সক্ষম হবে নারী।

তথ্যনির্দেশ

১. মালেকা বেগম, *নারীমুক্তি আন্দোলন*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫, পৃ. ৪১।

২. *ঐ*, পৃ.২৪।

৩. *ঐ*, পৃ. ১৯।

৪. *ঐ*, পৃ.২৩।

৫. *ঐ*, পৃ. ২১।

৬. *ঐ*, পৃ. ২৩।

৭. *ঐ*, পৃ.৩০।

৮. রিটা মে কেলি ও মেরী বুটিলিয়ার, *রাজনৈতিক নারীর অভ্যুদয়*, অনু: নুরুল ইসলাম খান, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯১, পৃ.৬৭।

৯. মালেকা বেগম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩১-৩২।

১০. মালেকা বেগম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৪।

১১. মাহমুদা ইসলাম, *নারী ইতিহাসে উপেক্ষিত*, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৪, পৃ. ১০৭।

১২. মালেকা বেগম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৯।

১৩. 'দৈনিক সমকাল', ২৮ অক্টোবর,২০০৫।

১৪. মালেকা বেগম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪০।

১৫. মালেকা বেগম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭০।

১৬. শ্যামলী আকতার প্রমুখ, *নারী শিক্ষা উদ্ভব ও বিকাশ*, ঢাকা: স্টুডেন্ট ওয়েজ, ২০০১, পৃ. ৭০।

১৭. *ঐ*, পৃ. ৭১।

১৮. *ঐ*, পৃ. ৭২।

১৯. মালেকা বেগম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭১।

২০. মালেকা বেগম, সৈয়দ আজিজুল হক, *আমি নারী তিনশত বছরের বাঙ্গালী নারীর ইতিহাস (প্রাচীনকাল-বাংলাদেশের স্বাধীনতা পূর্ব কাল)*, ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০১, পৃ. ১৮৬ ।

২১. শ্যামলী আকতার প্রমুখ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৫।

২২. কনক মুখোপাধ্যায়, *নারী আন্দোলনের নানা কথা*, কলকাতা: ন্যাশনার বুক এজেন্সি ২০০১, পৃ. ১৫।

২৩. মালেকা বেগম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮২।

২৪. মালেকা বেগম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩৯।

২৫. কে. মমতাজ, এফ. শহীদ, *পাকিস্থানে নারীর মর্যাদার আইনগত অবনতি*, অনুবাদ হাসিনা আহমেদ, সমাজ নিরীক্ষণ, ঢাকা, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সংখ্যা ৩১, পৃ. ৭২।

২৬. *ঐ*, পৃ. ৯২।

২৭. *ঐ*, পৃ. ৮৬।

২৮. *ঐ*, পৃ. ৮৭।

২৯. আনু মুহাম্মদ, *নারীর অগ্রগতি ও পশ্চাদাপসরণ এবং বিপ্লব উত্তর সমাজ*, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা: আগষ্ট ১৯৯৫, পৃ. ৫৭।

৩০. *ঐ*, পৃ. ৮৫।

৩১. *ঐ*, পৃ. ৮৫।

৩২. Elizabeth Croll, *The Women's Movement in China, A Selection of Readings, 1949-1973,* London, 1974, P. 74.

৩৩. *জাতিসংঘ চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন বেইজিং ঘোষণা ও কর্ম পরিকল্পনা*, অনু:, মালেকা বেগম, ১৯৯৭, পৃ. ২১।